بسم الله الرحمٰن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০২ ডিসেম্বর, ২০১৬ মোতাবেক ০২ ফাতাহ, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

কতক পদধারী কর্মকর্তা বা যারা পদধারী নয়, এমন মানুষের বিরুদ্ধে অনেক মানুষ অভিযোগ করে বলে যে, এরা এমন, এরা তেমন। এই ব্যক্তি অমুক অপরাধ করেছে আর সে শরীয়ত বিরোধী অমুক অপকর্ম করেছে, তাই তাৎক্ষণিকভাবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। কেননা, এরা জামা'তের দুর্নাম করছে। কিন্তু এমন অভিযোগকারীদের অধিকাংশই তাদের পত্রে নিজেদের নাম লিখে না আর লিখলেও ছদ্মনাম ব্যবহার করে ও মনগড়া ঠিকানা লিখে তা পাঠিয়ে দেয়। এমন লোকদের অভিযোগে স্পষ্টতঃই কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না আর ব্যবস্থা নেয়া সম্ভবও নয়। এভাবে কিছুকাল কেটে যাওয়ার পর পুনরায় অভিযোগ আসে, আমি অভিযোগ করেছিলাম, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। যদি ব্যবস্থা নেয়া না হয়, তাহলে অনেক বড় অন্যায় হয়ে যাবে। পাক-ভারতের লোকদের মাঝে এরূপ বেনামী অভিযোগ করার ব্যাধি বেশি দেখা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ খুব কমই আসে। কিন্তু বহির্বিশ্বের দেশসমূহে বসবাসকারী পাকিস্তানীদের অনেকের মাঝেও এই ব্যাধি রয়েছে। অর্থাৎ, তারা এমন বেনামী অভিযোগ করে। আর এটি নতুন কোন বিষয় নয়, সকল যুগেই এরূপ অভিযোগকারী ছিল, যারা এমন অভিযোগ করত, যেভাবে আজকাল কেউ কেউ আমাকে লিখে থাকে। অনুরূপভাবে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে, খিলাফতে সালেসা এবং খিলাফতে রাবেয়ার যুগেও এমন অভিযোগকারী ছিল, যারা বেনামী অভিযোগ করত।

এমনই একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি খুতবা প্রদান করেছিলেন। যেহেতু, এ ধরণের লোকদের মুখ বন্ধ করার জন্য এটি একটি যথার্থ ও সুস্পষ্ট খুতবা, তাই সেই খুতবার আলোকে আমি আজকে কিছু কথা বলার জন্য মনোস্থির করেছি।

যেসব অভিযোগকারী নিজেদের নাম লেখে না আর লিখলেও ছদ্মনাম লিখে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল, এরা হয় মুনাফিক বা কপট নয়তো মিথ্যাবাদী। তাদের মাঝে সৎসাহস ও সততা থাকলে তাদের কোন কিছুরই তোয়াক্কা করার কথা নয়। তারা তো এ অঙ্গীকার করে যে, নিজ প্রাণ, সম্পদ, সময় এবং সম্মান উৎসর্গ করার জন্য আমরা সদা প্রস্তুত থাকব। কিন্তু তাদের ধারণা অনুসারে যখন জামা'তের সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন আসে, তখন তারা নিজের নাম গোপন করতে আরম্ভ করে, যেন কোথাও তাদের সম্মান ও মর্যাদার হানি না ঘটে। অতএব, যে ব্যক্তি সূচনাতেই দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে, তার বাকি মতামতও ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের কাছে কোন সংবাদ এলে তোমরা তা যাচাই করে দেখে নিও। আর এ বিষয়টি প্রত্যেক বিবেকবান জানে, যে কোন তদন্তের জন্য বক্তব্য উপস্থাপনকারীর বক্তব্য শোনা মাত্রই সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হতে পারে না আর হয়ও না। বরং দেখা হয়, যে ব্যক্তি অভিযোগ উত্থাপন করেছে, সে নিজে কেমন মানুষ, তার মাধ্যমেই তদন্ত শুরু হয়। প্রথমে তার সম্পর্কে এ তদন্ত হবে যে, সে সকল প্রকার অন্যায় থেকে পবিত্র কি না, সে নিজে কোন অপকর্মে লিপ্ত নয় তো আর ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল নয় তো? অথবা এটি অনভিপ্রেত যে, সে নিজে ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল হবে আর অন্যদের উপর অপবাদ আরোপ করবে যে, অমুক ব্যক্তি এমন, তেমন। প্রায়শঃ দেখা যায়, অন্যের উপর যারা গুরুতর অপবাদ আরোপ

করে, হোক সে কোন পদধারী কর্মকর্তা বা অন্য কেউ, এমন ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ আপত্তি অথবা খুব জোরালোভাবে আপত্তি তারা তখনই উত্থাপন করে, যখন দেখে, তাদের ব্যক্তিস্বার্থ অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে যাচ্ছে। অতএব, তদন্ত করার পূর্বে এটি দেখতে হয়, অভিযোগকারী কেমন, সে কি মু'মিন, নাকি ফাসেক? অভিযোগকারী সম্পর্কে কোন তথ্য না থাকায় এটিও বলা যায় না, সে কোন্ শ্রেণীর মানুষ। অবশ্য এটি সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি যদি এমন কথা লিখে, যা জামা'তের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাহলে নিজস্ব রীতি অনুসারে সেটির তদন্ত করা হয়। অনুরূপভাবে, এটিও যদি জানা থাকে যে, অভিযোগকারী কে, তাহলে আমি যেমনটি বলেছি, প্রথমে সে ব্যক্তির নিজের আচার-আচরণ সম্পর্কে তদন্ত হবে। অনুরূপভাবে, সে যেসব কথা বলেছে, সেগুলোর সত্যতা সম্পর্কেও নিজস্ব আঙ্গিকে তদন্ত হবে, যাতে স্পষ্ট হয়, সে সত্য বলছে কি, মিথ্যা? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কুরআনী শিক্ষা হল, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (সূরা আল্ হুজুরাত: ৭) অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যদি কোন ফাসেক বা বিশৃঙ্খলায় আসক্ত ব্যক্তি অভিযোগ নিয়ে আসে আর কারো সম্পর্কে কোন খারাপ কথা বলে, তাহলে বার্তাবাহক সম্পর্কে প্রথমে তদন্ত কর আর এরপর কোন ব্যবস্থা নাও। অথচ নিজের নাম প্রকাশ না করে অভিযোগকারী একদিকে নিজেই অপরাধ করে, তদুপরি এ কথা বলে, তার কথা যেন সেভাবেই গৃহীত হয়, যেভাবে সে লিখেছে আর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে যেন তার বিরুদ্ধে শাস্তির ফরমান জারি করা হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, 'ফাসেক' শব্দের অর্থ শুধু পাপাচারীই নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই, আরবী ভাষায় পাপাচারীকেও 'ফাসেক' বলা হয়, কিন্তু আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকেও 'ফাসেক' বলে, যে রগচটা স্বভাবের, অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে যায়। 'ফিসক' শব্দের একটি অর্থ হল, ইতায়াত বা আনুগত্য না করা। আনুগত্যের গণ্ডি অতিক্রমকারী ব্যক্তিকেও 'ফাসেক' বলে। যে ব্যক্তি সহযোগিতা করে না, তাকেও 'ফাসেক' বলে। অর্থাৎ, যে ঝগড়ুটে তো বটেই আবার সহযোগিতাও করে না। এছাড়া 'ফাসেক' শব্দ সেই ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি মানুষের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরে। আর একই সাথে এটিও মনে করে এবং বলে, সে যা কিছু বলেছে, সে অনুসারে দ্বিতীয় পক্ষের চরম শাস্তি পাওয়া উচিত, ক্ষমা করার কোনই সুযোগ নেই। বদরাগী মানুষকেও 'ফাসেক' বলা হয়ে থাকে।

এক আহমদী বন্ধু সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, তিনি প্রবীণ নিষ্ঠাবান এক আহমদী ছিলেন আর তার নিষ্ঠায় কোন সন্দেহও নেই। কিন্তু তুচ্ছ বিষয়েও বড় বড় ফতওয়া প্রদানে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। তিনি (রা.) বলেন, তার প্রকৃতিতে এ ব্যাধি ছিল যে, তুচ্ছ ও নগণ্য বিষয়েও তিনি কুফরের নিচে কোন কথাই বলতেন না। যেমন-তেমন কোন বিষয় দেখলেই তিনি 'কুফ্র'-এর ফতওয়া দিয়ে বসতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি বলেন, মানুষ যখন তাশাহ্হুদ বা আত্তাহিয়্যাত-এ বসে, তখন ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো সোজা রাখতে হয় (পা সোজা রাখার নির্দেশ রয়েছে।)- এ বিষয়টিকেই ধরুন। তার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি এমনটি করে না, সে কুফরীর মত অপরাধ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার পায়ের আঙুলে ব্যথা ছিল (তাঁর গেঁটেবাত ছিল)-এ জন্য আমি তাশাহ্হুদ এ বসা অবস্থায় ডান পা সোজা করে বসতে পারতাম না। কিন্তু ইতিপূর্বে পা যখন সুস্থ্যাবস্থায় ছিল, তখন রাখতাম। তিনি (রা.) বলেন, হাফেয সাহেব (তিনি হাফেয ছিলেন) যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে হয়তো সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধেও কুফরী ফতওয়া জারি করে বসতেন। অতএব, এমন মানুষও রয়েছে। ফতওয়া জারি করার কারণ হল, এই ব্যক্তি পায়ের আঙ্গুল সোজা রাখে না আর এমনটি করা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত পরিপন্থী কাজ। অতএব, বুঝা গেল, মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের প্রতি তার ঈমান নেই। এখন মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের প্রতি যদি ঈমান না থাকে, তাহলে কুরআনের প্রতিও ঈমান নেই। আর

কুরআনের প্রতি যদি ঈমান না থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌র প্রতিও ঈমান নেই। অতএব, সে কাফির হয়ে গেছে। যাহোক, নিষ্ঠাবান হলেও ত্বরাপরায়ণ এমন মানুষের জন্য হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি নিজের নামও গোপন রাখে আবার ঈমানের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা প্রদর্শন করে আর অন্যদের বিরুদ্ধে ফতওয়াও প্রদান করে, এমন মানুষ তো 'ফাসেক' শব্দের যত অর্থ বর্ণিত হয়েছে, এর সবগুলো অর্থের নিরিখেই ফাসেক বলে গণ্য হয়।

অতএব, অভিযোগ করার সময় যারা নিজের নাম লিখে না, এমন সব অভিযোগকারীর নিকট এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত, নিজেদের পরিচয় গোপন করে অভিযোগ করার এ কাজটি কুরআনী নির্দেশের পরিপন্থী। কেননা, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, প্রথমে অভিযোগকারী সম্পর্কে তদন্ত কর। কোন প্রকার তদন্ত ছাড়াই শুধু অভিযোগকারীর কথার উপর ভিত্তি করে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হয়ে যায়, তাহলে জামা'ত উন্নতির পরিবর্তে ক্রমশঃ অবনতির দিকে ধাবিত হতে শুরু করবে। অবনতির শিকার হবে। যুগ খলীফা এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা, এতদুভয়ের পক্ষ থেকেই কোন ধরণের তদন্ত হবে না। যে যা-ই বলবে, সে কথার উপর ভিত্তি করেই ব্যবস্থা নেয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। আর এ বিষয়টি কখনোই জামা'তের জন্য উন্নতির কারণ হতে পারে না। এমনটি হলে যে কেউ দাঁড়িয়ে বলবে, আমার ইচ্ছানুসারে সিদ্ধান্ত উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা যদি জানিও যে, অভিযোগকারী ব্যক্তি খুবই সতর্ক, পুণ্যবান এবং নিষ্ঠাবান আর এমন ব্যক্তিও যদি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তথাপি সব কিছু জানা থাকা সত্ত্বেও অবশ্যই তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হবে এবং তদন্ত হবে। যেমনটি আমি বলেছি, অভিযোগকারী সম্পর্কে যদি এ নিশ্চয়তাও থাকে যে, সে পুণ্যবান, সৎ, ভুল করে না এবং নিষ্ঠাবানও, তবুও সেই বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করা হবে এবং তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হবে। কেননা, কোন ব্যক্তি এ কথা বলার অধিকার রাখে না যে, যেহেতু আমি এটি বলছি, তাই এভাবেই বুঝতে হবে আর সে অনুসারেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তিনি বলেন, মহানবী (সা.) একবার নামায পড়াচ্ছিলেন। নামাযে তিলাওয়াত করার সময় কোন ভুল হয়ে গেলে হযরত আলী (রা.) লোকমা দেন। কেননা, তিনি মুক্তাদিদের মাঝে ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তা পছন্দ করেন নি। তিনি (সা.) তাঁকে (রা.) বলেন, কে তোমাকে লোকমা দিতে বলেছে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই অপছন্দের একটি কারণ এও হতে পারে যে, তোমার জন্য আরো অনেক বড় কাজ নির্ধারিত আছে, এ সব ছোট খাটো কাজ অন্যদের জন্য থাকতে দাও। আর এটিও একটি অর্থ হতে পারে যে, এ কাজ সে সব ক্বারীর, যারা মহানবী (সা.)-এর কাছে কুরআন শিখতেন, তুমি এ কাজ তাদের জন্যই থাকতে দাও।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর কাছে বেনামী এই অভিযোগকারী সম্পর্কে বলেন, সেই অভিযোগকারী কোন সম্মানিত মানুষ হলে আমি তাকে বলতে পারি, তুমি এ সব কাজ অন্য কারো জন্য ছেড়ে দাও আর নিজের আসল কাজের প্রতি মনোযোগী হও। কিন্তু পত্র লেখক যেহেতু নিজের নামই প্রকাশ করে নি, তাই তার মর্যাদা এবং অবস্থান সম্পর্কে জানা সম্ভব নয় আর তাকে বোঝানোও সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, অভিযোগকারী বহু পদধারী কর্মকর্তা, নাযের এবং মহিলাদের উপরও অপবাদ আরোপ করতে আরম্ভ করেছিল, খুবই জঘন্য সব অপবাদ আরোপ করেছিল আর বলেছিল, অমুক অমুক ব্যক্তির ভেতরে এই এই দোষ-ত্রুটি রয়েছে। একদিকে, সে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছে যে, তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা পরিপন্থী কাজ করে, মহানবী (সা.) ও পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পরিপন্থী কাজ করাই যেহেতু অনেক বড় একটি দোষ, তাই তাদের মাঝে অনেক বড় বড় দোষ-ত্রুটি বিরাজমান। কোন মুসলমান যদি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা বিরুদ্ধ কোন কাজ না করে, তবে তা কোন দোষ বা অপরাধ নয়। কিন্তু সে যদি এ সব শিক্ষা বহির্ভূত কোন কাজ করে, তবে তা অপরাধ বা দোষ।

যাহোক, এই অভিযোগকারী একদিকে বলছে, এরা মহানবী (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষা পরিপন্থী কাজ করছে আর অপরদিকে সে নিজেই মহানবী (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষার বিরোধী কাজ করছে। কেননা, সে এই অভিযোগ এবং এর প্রমাণের স্বপক্ষে যে সব শর্ত আরোপ করেছে, সে নিজেই সেগুলোর লঙ্ঘন করছে আর অধিকাংশ মানুষই এমনটি করে। আমাকে যারা লিখে, তারা নিজেরাও এ শর্তগুলো ভঙ্গ করে থাকে। আসল বিষয় হল, কুরআনের শিক্ষা এবং সুন্নতের অনুসরণ করা। পবিত্র কুরআন বলে, কোন রাখ-ঢাক না করে যখন কথা বলা হয়, তখন এর স্বপক্ষে প্রমাণও উপস্থাপন করতে হবে এবং তদন্তও করতে হবে। কিন্তু নামই যেখানে প্রকাশ করা হচ্ছে না, সেখানে তদন্ত কীভাবে করা যেতে পারে? আর এটি তো কুরআনী শিক্ষার সুস্পষ্ট পরিপন্থী বিষয়। কাজেই, এমন অভিযোগকারী নিজেই কুরআনী শিক্ষা লঙ্ঘন করে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার অনুসরণ করাই হল সত্যিকার নেকী বা পুণ্য, এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। কোন ব্যক্তির নিজস্ব অভিরুচি বা সামাজিক প্রভাবের অধীনে কোন বিষয় যদি অপছন্দনীয় মনে হয় আর পবিত্র কুরআন এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে তা যদি সঠিক হয়, তবে তা সঠিক আর এতে দোষের কিছু নেই।

কিছু কিছু মানুষ, তাদের স্বভাব-প্রকৃতি এবং সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কোন কোন বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করে। কিন্তু তাদের কথা ধর্মের নামে হলেও এগুলোর কোন মূল্য নেই। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এ ঘটনাটি ইতিপূর্বেও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে এখন এটি পুনরায় উপস্থাপিত হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে সাথে নিয়ে রেল স্টেশনে পায়চারি করছিলেন। সে দিনগুলোতে পর্দার বিষয়ে খুব কড়াকড়ি করা হতো। (সে যুগে পর্দা খুব কঠোরভাবে পালন করা হতো।) মহিলারা পালকিতে করে স্টেশনে আসত। (সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা পালকিতে চেপে স্টেশনে আসত আর সেই পালকির ডানে-বামে চাদর দিয়ে পর্দা করা হতো এবং ট্রেনের বগি পর্যন্ত এমন আবদ্ধ অবস্থায়ই আসত আর সেই একই অবস্থায় বগিতে উঠিয়ে দেয়া হতো। তখন পর্দার এমন ব্যবস্থাই ছিল।) আর বগিতে উঠে আসন গ্রহণ করার পর জানালা বন্ধ করে দেয়া হতো (কেউ যেন মহিলাদের দেখতে না পায়)। তিনি (রা.) বলেন, এরূপ পর্দা যাতনার কারণ ছিল এবং ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী ছিল। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ করতেন। হযরত উম্মুল মু'মিনীন বোরকা পরিধান করতেন এবং ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়তেন। সেদিনও হযরত উম্মুল মু'মিনীন (রা.) বোরকা পরিহিতা ছিলেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে সাথে নিয়ে প্লাটফর্মে পায়চারি করছিলেন। [মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও সাথে ছিলেন।] মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের স্বভাবে তড়িঘড়ি কিছু করে ফেলার অভ্যাস ছিল। তিনি ভাবলেন, এমনটি করা ঠিক হচ্ছে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সরাসরি কিছু বলার মত সাহসও তার ছিল না, তাই তিনি খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে যান এবং বলেন, এ কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড হচ্ছে? আগামীকালের পত্র-পত্রিকায় তো হৈচৈ পড়ে যাবে আর বিজ্ঞাপন ও নিবন্ধ প্রকাশিত হবে যে, মির্যা সাহেব তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে প্লাটফর্মে পায়চারি করছিলেন। অতএব, আপনি গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে একটু বুঝান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, এতে দোষের কী আছে? আমার কাছে তো খারাপ কিছু মনে হচ্ছে না। আপনার দৃষ্টিতে যদি খারাপ মনে হয়, তাহলে আপনি নিজেই গিয়ে বলুন। যাহোক, মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যান। তিনি পায়চারি করতে করতে অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মাথা নিচু করে ফিরে আসেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, তিনি কী উত্তর পেলেন, তা জানার জন্য আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মৌলভী সাহেব! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কী

বলেছেন?' মৌলভী সাহেব বললেন, আমি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বললাম, এটি আপনি কী করছেন, মানুষ কী বলবে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তরে বললেন, **কী আর বলবে? সর্বোচ্চ একথাই বলবে, মির্যা সাহেব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পায়চারি করছিলেন।** মৌলভী সাহেব লজ্জিত হয়ে ফিরে আসেন। হযতর উম্মুল মু'মিনীন পর্দা করেছিলেন আর স্বামী-স্ত্রী'র এক সাথে পায়চারি করা আপত্তির কোন বিষয়ও নয়। মহানবী (সা.) নিজেও তাঁর স্ত্রীদের সাথে নিয়ে এভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আর একবার তিনি (সা.) জনসমক্ষেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেন। প্রথমবার মহানবী (সা.) পিছিয়ে থাকেন এবং হযরত আয়েশা (রা.) জিতে যান। কিছুক্ষণ পর পুনরায় দৌড় প্রতিযোগিতা হয় আর মহানবী (সা.) বিজয়ী হন এবং হযরত আয়েশা (রা.) পরাজিত হন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে আয়শা! **'তিলকা বে তিলকা'** অর্থাৎ, হে আয়েশা! এটি হল তোমার সেই বিজয়ের পাল্টা পরাজয়। মোটকথা, মহানবী (সা.) নিজের স্ত্রীদের সাথে ঘুরে বেড়ানোকে অপছন্দনীয় মনে করতেন না আর ইসলাম যে কাজের অনুমতি দিয়েছে, সেটিকে দোষের কিছু বলা যাবে না। অতএব, কোন ব্যক্তির অন্য কারো উপর আপত্তি করার অর্থ, তার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ করে না।

অভিযোগকারী সম্পর্কে তিনি (রা.) পুনরায় বলেন, কিন্তু সে তার পত্রে লিখেছে, অমুক ব্যক্তি নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। (এখানে ব্যক্তিগত ও বংশগত আপত্তিও শুরু হয়ে গেছে।) অমুক ব্যক্তি নীচু শ্রেণীর মানুষ তথাপি আপনি তাকে অমুক পদ দিয়ে রেখেছেন। এছাড়া এমন আরো কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছে, যেগুলো সম্পর্কে শরীয়ত সাক্ষী দাবি করে আর তাও আবার চাক্ষুস সাক্ষী হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, এ প্রসঙ্গে শরীয়তের শিক্ষা হল, চারজন যদি চাক্ষুস সাক্ষী থাকে, তাহলেই তা যথাযথ অভিযোগ হিসেবে গণ্য হবে, অন্যথায় নয়। অনেকে এমনিতেই কোন ছেলে ও মেয়ের মাঝে অবৈধ সম্পর্কের অপবাদ আরোপ করে থাকে। অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ আনতে হলে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে চারজন সাক্ষী থাকা আবশ্যক। তিনি (রা.) বলেন, বিস্ময়ের বিষয় হল, ধর্মীয় আত্মাভিমান এমন এক ব্যক্তির হৃদয়ে দানা বেঁধেছে, যে নিজেই ইসলামী শিক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করেছে আর অন্যদের উপর এমন সব অপবাদ আরোপ করেছে, যা আরোপ করতে পবিত্র কুরআন নিষেধ করেছে আর শুধু নিষেধই করে নি বরং এমন অপবাদের জন্য শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে। কারো প্রতি অন্যায়ভাবে অপবাদ আরোপকারীকে, অর্থাৎ- যারা এমন কথা বলে, তাদেরকে ৮০বার বেত্রাঘাত করো। যে বিষয়ে শরীয়ত এত কঠোর নির্দেশ দিয়েছে, সে তো সেটির লঙ্ঘন করেছেই, আবার বলে, অমুক ব্যক্তি কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থী কাজ করেছে। অথচ সে নিজেই কুরআনী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করছে।

তিনি (রা.) বলেন, দেখ! অভিযোগকারীদের অবস্থান কী হয়েছে? প্রথমত সে তার নাম প্রকাশ করে নি এবং এরপর প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিও উপস্থাপন করে নি। আমি নিজেও শরীয়তের বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে নই আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও নন। স্বয়ং মহানবী (সা.) শরীয়তের শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করতে বাধ্য ছিলেন। অতএব, সেই ব্যক্তি এমন কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছে, যার জন্য শরীয়ত শাস্তি প্রস্তাব করে সীমা নির্ধারিত করে রেখেছে। আর শরীয়ত সাক্ষ্য উপস্থাপনের যে পদ্ধতি শিখিয়েছে, তা অনুসরণ করা আবশ্যক। কিন্তু সে বলে, অমুক ব্যক্তি অমুক কুরআনী শিক্ষা লঙ্ঘন করেছে। কাজেই, তাকে শাস্তি দাও আর আমাকে কিছুই বলো না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, শৈশবের একটি কৌতুকপূর্ণ ঘটনা আমার মনে পড়ছে। তখন আমি এটিকে খুব উপভোগ করেছিলাম আর মনে পড়লে আজও আমার হাসি পায়। তিনি (রা.) বলেন, তখন আমি পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তাম। আমাদের শিক্ষক এ রীতি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তার প্রশ্নের উত্তর যে ছাত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দিতে সক্ষম হবে, তার রোল নম্বর এগিয়ে আসবে। আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। শিক্ষক প্রশ্ন করেন আর এক ছাত্র এর উত্তর দেয়। দ্বিতীয় ছাত্র হাত তুলে বলে, শিক্ষক মহাশয়! এই উত্তর ভুল। শিক্ষক প্রথম ছাত্রকে বলেন, তুমি

নিচে নেমে যাও আর দ্বিতীয় ছাত্রকে বলেন, তুমি উপরে চলে আস। নিচে যেতেই সেই ছাত্র, যে পূর্বে উপরের নম্বরে ছিল সে বলে, শিক্ষক মহাশয়! সে আমার ভুল ধরতে গিয়ে 'গলত' শব্দের উচ্চারণ করতে গিয়ে 'গাল্‌ত্' বলেছে, যা একটি ভুল উচ্চারণ। শিক্ষক পুনরায় তাকে পূর্বের জায়গায় বহাল করে দেন এবং দ্বিতীয় ছাত্রকে আবার নিচে নামিয়ে দেন। তাই তিনি (রা.) বলেন, কতক আপত্তিকারীর অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। তারা অন্যদের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত বা সঠিক আপত্তি করে থাকে, কিন্তু তাদের আপত্তি করার রীতিটি অন্যায় হয়ে থাকে। আর এভাবে তাকে শাস্তির মুখোমুখি করতে গিয়ে নিজেরাই শাস্তিযোগ্য হয়ে যায়। আর এরপর তারা হৈচৈ শুরু করে, অপরাধীকে কেউ কিছু বলে না, বরং যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই শাস্তি দেয়া হয়। শাস্তিদাতারা করলেও আর কী করবেন, তারাও তো শরীয়তেরই গোলাম। তোমরা যদি কুরআনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তবে নিজের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার অনুশাসনকে শিরোধার্য কর। তোমরা যদি চাও, অন্যদের উপর খোদার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক আর তোমাদের উপর তা প্রতিষ্ঠিত না হোক, তাহলে এমনটি সঙ্গত নয়। তাই, অভিযোগকারীদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, **'আইয়্যায কাদরে খুদ বেশানাস'** অর্থাৎ, হে আইয়্যায! তোমার নিজের অবস্থান এবং মর্যাদার কথা প্রথমে স্মরণ রাখ এবং অনুধাবণ কর। ছদ্মবেশী ব্যক্তিরা নিজেদের নাম গোপন রেখে অন্যদের উপর অপবাদ আরোপ করে, এদের কোন মর্যাদাই নেই আর অপবাদের স্বপক্ষে যে সব প্রমাণ উপস্থাপন করে তা হল, অমুক ব্যক্তি অমুক বংশের লোক, তাই তার কোন অবস্থান নেই এবং সে এমন। অথচ এমন অপবাদের কোন গুরুত্বই থাকে না আর যারা অপবাদ আরোপ করে, তারা নিজেরাও আসলে গুরুত্বহীন মানুষই হয়ে থাকে। কাজেই, আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারেই চলতে হবে, যিনি আমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক আর সবারই প্রভু-প্রতিপালক। তিনি সবার জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করেন এবং লালন-পালন করেন। অতএব, সব কিছুই যখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে নিচ্ছি, তখন অপবাদ আরোপকারীর কথা নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার কথাই আমাদের মানতে হবে। আমি যেমনটি বলেছি, অভিযোগকারীরা এটাই চায়, অন্যদেরকে যেন শরীয়ত অনুসারে শাস্তি দেয়া হয় আর নিজেদেরকে তারা শরীয়তের নির্দেশের বাহিরে রাখে, নিজেদেরকে শরীয়তের শিক্ষার ঊর্ধ্বে জ্ঞান করে। নিজেরাই নিজেদের বিচারক সাজে। অতএব, এমন সব মানুষের বিষয় যখন সামনে আসবে এবং স্পষ্ট হবে, তখন তারাও শরীয়তের শিক্ষা অনুসারেই শাস্তি পাবে।

এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যে ক্ষেত্রে সাক্ষীর প্রয়োজন পড়ে। সাক্ষী যদি সামনে না আসে, তবে সেই কথার কোন গুরুত্বই থাকে না। আর শরীয়ত ও কুরআনী শিক্ষা অনুসারেই এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত হবে।

অনেক সময় বলা হয়, সে মিথ্যা কসম খেয়ে শাস্তি এড়াতে সক্ষম হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর দরবারে একবার এমন একটি বিষয় উপস্থাপিত হয়। বিবাদে লিপ্ত দু'পক্ষ রসূলে করীম (সা.)-এর নিকট এলে তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে এক পক্ষ কসম খাবে। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, সে মিথ্যাবাদী, সে তো একশ' বারও কসম খেতে পারবে। তিনি (সা.) বলেন, আমি খোদার নির্দেশ অনুসারে সিদ্ধান্ত নিব। সে যদি মিথ্যা কসম খায়, তাহলে তার বিষয়টি খোদার হাতে, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাকে শাস্তি দিবেন। **(খুতবাতে মাহমুদ, ৩৩তম খণ্ড, পৃ. ২৬৫-২৭১, খুতবার তারিখ, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫২)**

অতএব, সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, কারো অভিযোগের প্রেক্ষিতে শুধু তার প্রস্তাব অনুসারেই সিদ্ধান্ত হবে না, বরং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে খোদা তা'লার নির্ধারিত নীতি অনুসারে। যে ক্ষেত্রে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে দু'জন সাক্ষীকেই উপস্থিত করতে হবে আর যে ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে চারজন সাক্ষীই উপস্থিত করতে হবে। আর সেই অনুসারেই তদন্ত হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আমরা যদি খোদার নির্দেশ অনুসারে আমাদের বিষয়াদির

নিষ্পত্তি করি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তবে এতেই আমাদের সাফল্য নিহিত। নিজেদের আমিত্ব এবং পছন্দ-অপছন্দকে ভিত্তি করে জামা'তী নিযাম এবং যুগ খলীফাকে আমরা যেন এভাবে বাধ্য করার চেষ্টা না করি যে, এ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়া হোক। আল্লাহ্ তা'লা অভিযোগকারীদের বিবেক-বুদ্ধি দিন। সঠিক মনে করলে তারা যেন সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণসহ অভিযোগ করে, যাতে তাদের নাম-ঠিকানা থাকবে এবং তারা নিজেরাও তদন্তে অন্তর্ভুক্ত হবে। মানুষ যখন জামা'তের ব্যবস্থাপনার মাঝে কোন ব্যত্যয় ঘটতে দেখবে, তখন অবশ্যই তার উচিত, বীরত্বের সাথে সামনে আসা, অভিযোগ করা এবং সব কিছুর মোকাবিলা করা। একইভাবে জামা'তের ব্যবস্থাপনাকেও আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক ও বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। অর্থাৎ, যুগ খলীফার পক্ষ থেকে যাদের হাতে সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, তারাও যখন সিদ্ধান্ত দিবেন, তখন যেন ইনসাফ বা ন্যায়-নীতির প্রতিটি দিক সামনে রাখেন এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ ও সুন্নতের অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নামাযের পর আমি গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথম জানাযাটি হবে এক শহীদের। তিনি জনাব শেখ মজিদ আহমদ সাহেবের পুত্র মোকাররম শেখ সাজেদ মাহমুদ সাহেব। মরহুমের বয়স ছিল ৫৫ বছর। তিনি করাচী জেলার গুলজার হিজরী হালকায় বসবাস করতেন। বিরোধীরা গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ সনে মাগরিবের নামাযের পর বাড়ির বাহিরে গাড়িতে বসা অবস্থায় গুলি করে তাকে শহীদ করে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অনুসারে শেখ সাজেদ মাহমুদ সাহেব করাচীর শালিমার-এ ময়দার কারখানায় স্পেয়ার পার্টস সরবরাহের কাজ করতেন। ২০১৬ সনের ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাযের পর বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রী কিনে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। তখনও তিনি গাড়িতেই বসা ছিলেন, যখন অজ্ঞাত পরিচয় মটর সাইকেল আরোহী এক ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে চারবার গুলি করে। এরপর যাওয়ার সময় আরো চারবার গুলি করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সেগুলোর একটি গুলি সাজিদ মাহমুদ সাহেবের বুকের ডান দিকে আঘাত করে এবং পাঁজর ভেদ করে বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। আরেকটি গুলি তার পায়ে লাগে। সাজেদ মাহমুদ সাহেবকে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে আগাখান হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়, কিন্তু তার প্রাণ রক্ষা হয় নি। চিকিৎসা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাদের বংশে আহমদীয়াত প্রবেশ করে তার বড় দাদা জনাব শেখ ফযল করীম সাহেবের মাধ্যমে। ১৯২০ সনে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। শহীদ মরহুমের পিতা শেখ মজিদ আহমদ সাহেব পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের কানপুর থেকে হিজরত করে লাহোর চলে আসেন। পরবর্তীতে ১৯৬১ সনে তিনি করাচীতে বসবাস করতে শুরু করেন। শহীদ মরহুমের দাদা জনাব খাজা মোহাম্মদ শরীফ সাহেব দীর্ঘ দিন লাহোরের 'দেহ্লী দারওয়াজা' জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার বড় নানা হযরত ছাহেব উদ্দীন সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। অনুরূপভাবে কলিকাতার মরহুম শেঠ মোহাম্মদ সিদ্দীক বাণী সাহেব শহীদ মরহুমের স্ত্রী'র নানা ছিলেন। শহীদ মরহুম বিএ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ভীষণ কষ্টের মাঝে পাঁচ বছর অতিবাহিত করার পর তিনি আটার মিলে স্পেয়ার পার্টস সরবরাহের ব্যবসা আরম্ভ করেন, যাতে আল্লাহ্ তা'লা প্রভূত বরকত দান করেন, ফলে তার ব্যবসা অনেক প্রসার লাভ করে। শহীদ মরহুমের পুত্র হারেস মাহমুদ সাহেব, নায়েব কায়েদ আর একই সাথে করাচীর গুলশান-এ ইকবাল এর সেক্রেটারী ওসীয়্যতও। তার পুত্র পড়াশোনা শেষে 'এসিসিএ' করার পর পিতার সাথেই তার ব্যবসায় যোগ দেন। শহীদ মরহুম বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে, শহীদের কন্যা সানা মুবাশ্বেরা সাহেবা করাচীতে পড়াশুনা করছেন। ৬ মাসের বৃত্তি নিয়ে তিনি আমেরিকা যাওয়ার সুযোগও লাভ করেছেন এবং

সেখান থেকে একটি শর্ট কোর্স করে এসেছেন। খিলাফতের প্রতি মরহুমের ঐকান্তিক ভালোবাসা এবং গভীর সম্পর্ক ছিল। সন্তান-সন্ততিকে তিনি সর্বদা খিলাফত এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার নসীহত করতেন। তিনি নিজেও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে চাঁদা দিতেন আর ছেলেকেও এ বিষয়ে নসীহত করতেন। চাঁদা প্রদানের বিষয়ে তিনি সব সময় সোচ্চার থাকতেন। চাঁদার জন্য দোকানে একটি পৃথক ব্যাংক রেখেছিলেন, যাতে তিনি চাঁদার টাকা জমা করতেন। লেনদেনের ক্ষেত্রে খুবই বিশ্বস্ত ও দিয়ানতদার ছিলেন। সর্বদা তিনি সত্যকে অগ্রগণ্য রাখতেন এবং মার্জনা করতেন। ভাই-বোনদের সাথে সব সময় নম্র আচরণ করেছেন আর কখনোই কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন না। মরহুম পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী এবং পরিস্কার মনের একজন মানুষ ছিলেন। রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শহীদ মরহুম তার দু'টি দোকানের নাম করণ করেছিলেন মরহুম পিতা ও শ্বশুরের নামে। স্ত্রীর আত্মীয়দের সাথে তিনি অনুকরণীয় উত্তম ব্যবহার করতেন। বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সরল মনে সাক্ষাৎ করতেন। তার হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষের লেশমাত্রও ছিল না। বিভিন্ন মানুষ যা কিছু লিখেছে, সে সব কথার সারাংশ তা-ই, যা আমি শহীদের গুণাবলী হিসেবে তুলে ধরেছি। শহীদ মরহুমের মাতা আজকাল খুবই অসুস্থ, তার অসুস্থতার কারণে ছেলের শাহাদত সম্পর্কে তাকে জানানো কঠিন ছিল। কিন্তু তিনি যখন তা জানতে পারেন এবং ছেলের মৃতদেহ দেখেন, তখন তিনি অবলীলায় বলে উঠেন, **'আমার ছেলে শহীদ, কেউ কাঁদবে না।'** আর এই কথাটি তিনি বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেন। শহীদ মরহুমের শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে স্বামীর শাহাদতের সংবাদ শোনেন এবং পরম ধৈর্য প্রদর্শন করেন। তার পুত্র বলেন, আমার পিতা খুবই ধীর-স্থীর স্বভাবের মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্‌র প্রতি তিনি অটল বিশ্বাস রাখতেন। তিনি বারবার বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছেন আর এত সম্মান দিয়েছেন, আমি নিজেও তা ভাবতে পারি না। ইবাদতে খুবই নিয়মানুবর্তী ছিলেন। মরহুমের আত্মীয়-স্বজনরাও বলেন, তিনি খুবই সরল প্রকৃতির, সহানুভূতিশীল এবং বিনয়ী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। মরহুমের ১১ জন ভাই-বোন আর তাদের সবারই স্ত্রী-সন্তান রয়েছে। শহীদ মরহুম তাদের সবার সাথে উত্তম আচরণ করতেন এবং দেখাশোনা করতেন। সখ্‌খর জেলায় যখন জামা'তী অবস্থার অবনতি ঘটে এবং শাহাদতের ঘটনা ঘটে, তখন শহীদ মরহুম সেখানে গিয়ে বেশ কিছুদিন এক নাগাড়ে ডিউটি করেছেন। তার মেয়ে বলেন, তার মৃত্যুর পর আমি স্বপ্নে দেখেছি, অনেক বড় একটি বাগানে জ্যোতির্ময় চেহারার বহু মানুষ একত্রে অবস্থান করছে। তাদের সবাই উজ্জ্বল শুভ্র পোশাক পরিহিত এবং আব্বুও সেখানে আছেন। তার মর্যাদা অনেক উঁচু। সবাই আব্বুকে ঘিরে ধরে আনন্দ প্রকাশ করছে। পরে আমার বাবা একদিকে যাত্রা করেন আর সবাই দলবদ্ধভাবে তাকে অনুসরণ করতে থাকে। আর সবাই তার পিতাকে দেখে আনন্দিত হচ্ছিল। যেমনটি আমি বলেছি, শহীদ মরহুমের শ্রদ্ধেয়া মা দৈহিকভাবে খুবই দুর্বল, চলাফেরা করতে পারেন না। শাহাদতের পর তিনি স্বপ্নে দেখেন, শহীদ মরহুম তার মাকে সম্বোধন করে বলছেন, আমি এখানে খুবই আনন্দিত এবং শান্তিতে আছি, আমার জন্য আপনি মোটেও দুঃশ্চিন্তা করবেন না। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে শ্রদ্ধেয়া মা, স্ত্রী মনসুরা ইয়াসমিন, ছেলে শেখ হারেস মাহমুদ, কন্যা সানা মুবাশ্বেরা সাহেবা ছাড়াও চার ভাই এবং ছয় বোন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততিকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী জানাযা শ্রদ্ধেয় শেখ আব্দুল কাদির সাহেবের। তার পিতার নাম শেখ আব্দুল করীম সাহেব। তিনি কাদিয়ানের দরবেশ ছিলেন। ২০১৬ সনের ২৬ নভেম্বর তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৯২ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বংশে আহমদীয়াত প্রবেশ করে হযরত আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব-এর মাধ্যমে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। ১৯৪৭ সনে নভেম্বর মাসে যখন কাদিয়ান থেকে শেষ কাফেলা পাকিস্তানের

উদ্দেশ্যে যাত্রা করে, তখন তার অসুস্থ মা তার শরীরে হেলান দিয়ে ট্রাকে বসে ছিলেন, কাদিয়ানের সীমান্তের কাছে এসে তার মা তাকে কেন্দ্রের হিফাজতের জন্য ট্রাক থামিয়ে নামিয়ে দেন আর এভাবে তিনি দরবেশীর সৌভাগ্য লাভ করেন। খিলাফত ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা ছিল। আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং প্রতিটি সাফল্য ও ব্যর্থতাকে খোদার সন্তুষ্টি মনে করে হাসি মুখে বরণ করতেন। স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সব সময় ভাল ব্যবহার করতেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিজ হাতে কাজ করেছেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের বিভিন্ন অফিসের বিভিন্ন বিভাগে তিনি দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পেয়েছেন। তার ছেলে লিখেন, আসন্ন জলসা সালানার উদ্দেশ্যে বাসার হোয়াইট ওয়াশের জন্য সিমেন্ট ইত্যাদি আনিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই রাতেই তিনি ডেকে বলেন, মনে হয় আমার শেষ সময় সন্নিকটে, অমুক ব্যক্তি থেকে পাঁচশ' রুপি নিয়েছিলাম, তা পরিশোধ করতে হবে আর একইভাবে অন্যান্য হিসাব-কিতাবের কথা অবহিত করে তিনি স্বল্পক্ষণের মাঝেই ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার রেখে যাওয়া পরিবার-পরিজনের মাঝে তিন মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। মরহুমের ছেলে জনাব নাসের ওয়াহিদ সাহেব কাদিয়ানে জামা'তের সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন।

তৃতীয় জানাযা তানভীর আহমদ লোন সাহেবের, যিনি কাশ্মীরের নাসেরাবাদের অধিবাসী। তিনি পুলিশ বিভাগে ছিলেন। গত ২৫ নভেম্বর দায়িত্বরত অবস্থায় জেলা সদরের কোলগামে অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীদের গুলিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ইনিও শহীদের মর্যাদা রাখেন, শহীদ মরহুম নামায-রোযায় খুবই অভ্যস্ত, পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, গরীবদের লালন-পালনকারী, মিশুক, চরিত্রবান, বিশ্বস্ত, মানবহিতৈষী, অত্যন্ত সাহসী এবং আল্লাহ্‌র উপর আস্থাশীল ব্যক্তি ছিলেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন, হার অনুসারে এবং বর্ধিতহারে নিয়মিত চাঁদা দিতেন। তিনি তার ছোট ভাই-বোনদের মনস্তুষ্টি করতেন, তাদের সাহায্য করতেন, তাদের পড়াশোনার ব্যাপারে সব সময় সচেতন থাকতেন। প্রতিবেশীদের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি সত্যিকার অর্থে প্রতিবেশীর প্রাপ্য প্রদানকারী ছিলেন। তার সহকর্মীদের বিবৃতি হল, তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে তিনি সব সময় সচেতন ও সোচ্চার থাকতেন। কখনোই তিনি আলস্য ও ঔদাসিন্য প্রদর্শন করতেন না। মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে মা ছাড়াও ২ বোন, ৬ ভাই, স্ত্রী এবং ৩ জন নিষ্পাপ শিশু রেখে গেছেন। তার এক পুত্র তাহরীকে ওয়াক্‌ফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তান-সন্ততিকে সব সময় জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত এবং পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন আর তিনি নিজেই তাদের তত্ত্বাবধানকারী হোন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত